দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 17 AUG 1992
পৃষ্ঠা 2 কলাম 7

30

মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ

দেশের চারটি বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল গত কয়েকদিনের মধ্যে পর পর প্রকাশিত হইয়াছে। চারটি বোর্ডে সর্বমোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ২২ হাজার ১ শত ৭৪ জন। তন্মধ্যে পাস করিয়াছে ৩ লক্ষ ১১ হাজার ৬ শত ৭৫ জন এবং ফেল করিয়াছে ২ লক্ষ ১০ হাজার ৪ শত ৯৯ জন। বোর্ডওয়ারী পাসের হার ঢাকা বোর্ডে ৬৩ দশমিক ৫, কুমিল্লায় ৬২ দশমিক ২৬, রাজশাহীতে ৬১ দশমিক ৩১ এবং যশোরে ৫৮ দশমিক ৭৯। অন্যান্য বছর অপেক্ষা এবার মাধ্যমিক পরীক্ষার পাসের হার উন্নত। তবে পাসের হারের এই উন্নতির সঙ্গে পরীক্ষার্থীদের শিক্ষা সাফল্যের কোন সম্পর্ক আছে কিনা এব্যাপারে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। কোন কোন শিক্ষা বিশেষজ্ঞের মতে, পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন।, বিশেষত নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন প্রবর্তনের কারণে পরীক্ষার্থীরা এবার বিভিন্ন পত্রে ঢালাওভাবে লেটার ও ষ্টার মার্ক পাইয়াছে। এই ফলাফলের সঙ্গে পরীক্ষার্থীদের শিক্ষা ও মেধার সম্পর্ক খুবই কম। চারটি বোর্ডের শীর্ষস্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকের অভিমত, এই ব্যবস্থায় পুরা পাঠ্য বই অধ্যয়নের তেমন প্রয়োজন হয় না, বাছাই করা প্রশ্নসমূহের উত্তর মুখস্থ করিলেই চলে। এক অভিভাবক বলিয়াছেন, এই ব্যবস্থায় পাস করা সহজ, ফেল করাই বরং কঠিন।

বলা বাহুল্য, এতদসত্ত্বেও চারটি বোর্ডে ফেলের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। বিশেষ করিয়া গণিতে ব্যাপকসংখ্যক পরীক্ষার্থীর ফেল এবং ১০ নম্বর গ্রেস দিয়া পাস করানোর যে সংবাদ পত্রিকায় ছাপা হইয়াছে তাহাতে প্রতীয়মান যে, পরীক্ষার্থীদের মান কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় নাই। অবশ্য ইহা অনস্বীকার্য যে, পূর্ববর্তী বছরগুলির তুলনায় গত মাধ্যমিক পরীক্ষায় নকলের প্রবণতা কমই ছিল। উল্লেখ প্রয়োজন যে, শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এখনো অতি পুরাতন। লেটার ও ষ্টার মার্ক কিংবা পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর উন্নত দেশে এখন আর ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান পরিমাপের মাপকাঠি নয়। সেখানে শিক্ষকরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষাদান করেন এবং ছাত্র-ছাত্রীরা নিষ্ঠার সঙ্গে তা গ্রহণ করে। শিক্ষাদানে ও শিক্ষা গ্রহণে ফাঁকির কোন প্রকার অবকাশ নাই এবং পরীক্ষা বর্ষ মধ্যে কিংবা বর্ষ শেষে হয় না। কিছুদিন পর পরই হয় কোর্স পদ্ধতিতে। আমাদের দেশের মত বছরে একবার দেশব্যাপী পরীক্ষার মহা আয়োজন হয় না এবং ইহার প্রয়োজনও পড়ে না। বস্তুত, এজন্য সেসব দেশে ছাত্র-ছাত্রীদের নকলের প্রয়োজনও পড়ে না। বাংলাদেশে তাই পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ধরন সংস্কার করিয়া নয়, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়াই শিক্ষার মান ও শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে পারে।

বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে কর্মের সম্পর্ক অতি সামান্য তাহা বলাবাহুল্য। এমনকি নিচু ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাপ্ত নম্বরও উচ্চ ক্লাসে বিষয় নির্বাচনীর মাপকাঠি নয়। তাই পৌরনীতির ছাত্র ভর্তি হয় ইসলামের ইতিহাস বিভাগে এবং বাংলার কৃতী ছাত্র চাকরি করে ব্যাঙ্কে। শিক্ষা ও মেধার এমন অবমূল্যায়ন সম্ভবত বাংলাদেশ ছাড়া আর কোথাও হয় না। অন্যদিকে এদেশে ডিবিএ'র সার্টিফিকেটের প্রতি যতটা মোহ অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীর, তাহার অংশমাত্র মোহ নাই শিক্ষা ও জ্ঞান লাভের প্রতি। সেজন্য বিশ্বাস করিতে হয়, যতদিনে কর্মের সঙ্গে অধীত জ্ঞানের ব্যবহারিক সামঞ্জস্য বিধান না হইবে ততদিনে এই অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটিবে না। আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি, পরীক্ষা পদ্ধতি শিক্ষা সমস্যার প্রধান কারণ নয়, প্রধান কারণ মানব উন্নয়নে শিক্ষার ব্যবহারে আমাদের অনীহা। শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষা প্রশাসনে সততা ও শৃংখলা পুনঃপ্রবর্তন করিয়া এব্যাপারে পদক্ষেপ গৃহীত হইলে এবং সকল মহল সহযোগিতা করিলে অবস্থার উন্নতি হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি।